অনন্ত
আলোর
ফোয়ারা

হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ. :

অনন্ত
আলোর
ফোয়ারা

ওয়াহিদুর রহমান

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

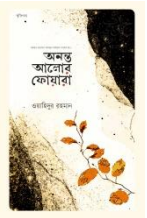

হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ. :

অনন্ত আলোর ফোয়ারা

ওয়াহিদুর রহমান

প্রথম প্রকাশ
জুমাদাল উখরা ১৪৪৩
জানুয়ারি ২০২২

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
তাইফ আদনান

পৃষ্ঠাসজ্জা
আবু আফরা

প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
অফিস : ৯/পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭১৬ ৭৯ ৭৫ ৪৯
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বইফেরি ৭/বি পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৫৯ ৮৭ ৭৯ ৯৯

মুদ্রণ
মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য
৩০০ ৳ টাকা মাত্র

কৃতজ্ঞতায়
মাদানী ফাউন্ডেশন

উৎসর্জন

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান
(১২৬৮-১৩৩৯ হিজরি) দেওবন্দি রহ.
তাঁর মতো আরেকজন রাহবারের বড্ড প্রয়োজন!

©

লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

বর্ণনাক্রম

প্রকাশকের কথা	০৯
শুরুর আগে	১১
সূচনা	১৭
তিনি ছিলেন আত্মার-আত্মীয়	২২
তাঁর সবকের মোহন সৌরভ	২৪
যেভাবে গড়ে তুললেন আমাদের	২৭
সূর্যোদয়, রাঙা-প্রভাত	৪১
প্রেরণার হৃদিপদ্ম দেওবন্দে	৫০
গঙ্গুহ জীবন : হিম্মতে মরদ	৫৭
মদদে-খোদা	৬৩
আকাবিরের ভালোবাসা	৬৬
জীবন-সম্পাদকের সন্ধানে	৭৫
জীবন-সম্পাদকের হাতে আত্মসমর্পণ	৮১
দেশে ফিরে এসে	৯১
কর্মজীবন	৯৪
তাঁর চোখে ইসলাহী জোড়	১০৫
সুলুকের মেহনত	১১৩
লৌহকপাট	১২৫
অন্য কলমে জেলজীবন	১৪০
মুফতি হাবিবুর রহমান সাহেবের স্মৃতি	১৫৪
মুফতি আমিনীর ডাকে রাজপথে	১৭১
'১৩ সালের তরঙ্গ	১৭৯
সফরে হিজাজ	১৮৪
অন্যন্য গুণাবলি	১৮৮
তাঁরা বলেছেন...	২২১
শেষ বিকেলের অস্তগামী সূর্য	২২৭

প্রকাশকের কথা

বন্ধুবর ও সহপাঠী ওয়াহিদুর রহমান, একজন প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী তরুণ– যার মাঝে আমি সতত প্রত্যক্ষ করি ভবিষ্যৎ নির্মাণের অমিত সম্ভাবনা। অনেকদিন পাশাপাশি থাকার সুবাদে তাকে খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে আমার। ফলে তার সম্পর্কে যতটুকু জানি তা বলতেই অনেক কালি খরচ হয়ে যাবে, কিছু বাড়িয়ে বলতে হবে না। ওয়াহিদুর রহমান যে পরিমাণ মেধা ও যোগ্যতা সংরক্ষণ করেন, সে অনুপাতে এতদিনে তার অনেক বই প্রকাশিত হয়ে যাবার কথা, যেমনটা অন্য অনেকের বেলায় ইদানীং হচ্ছে। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সেটা হয় নি। কারণ, ওয়াহিদ নানান বিষয়ে জ্ঞান রাখার পাশাপাশি একজন নেহাত সংবেদনশীল, অনুভূতিপ্রবণ ও শিল্পবোদ্ধা মানুষ। ত্বরিত কিছু একটা করে হইচই ফেলে দেওয়ার মানসিকতা সবসময় তার মধ্যে অনুপস্থিত দেখেছি। বরং যা-ই করা হোক, তার যথাযোগ্য শিল্পমান রক্ষায় তার সংবেদ সর্বদা সজাগ থেকেছে।

আমরা প্রায়ই যখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলতাম, 'ওয়াহিদ ভাই, কবে আপনার কোনো বই প্রকাশ পাবে?' তখন যথারীতি তার উত্তর হতো, 'ভাই আমি জীবনে প্রয়োজনে একটি মাত্র কাজ করব, তবুও সেটা সর্বোচ্চ নিখুঁত করার চেষ্টা করব!' বলাবাহুল্য যে, একজন মানুষের পক্ষে শতভাগ নিখুঁত কিছু করাটা যদিও দুঃসাধ্য ব্যাপার, তথাপি এমন তেজস্বী প্রতিজ্ঞা কাজকে যারপরনাই নিপুণ ও সুন্দরতম করে তুলতে যে বড় ভূমিকা রাখতে পারে, সেটা নিঃসন্দেহ। আগেই বলেছি, ওয়াহিদুর রহমান সম্পর্কে যা জানি তা লিখতে গেলে অনেক কালি খরচ করতে হবে, যার উপযুক্ত জায়গা এটা নয়। এখানে ততটুকুই বললাম, যা একজন নবীন লেখকের প্রথম বই হাতে নেওয়ার পূর্বে পাঠকের মনে তার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ভরসা সঞ্চার করে।

তো যাইহোক, একদিন ওয়াহিদুর রহমান যখন কথা প্রসঙ্গে জানালেন, তিনি মরহুম ওসতাদ মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ.-কে নিয়ে ব্যাপক পরিসরে একটি স্মৃতিগদ্য নির্মাণে রত আছেন। আমি তাৎক্ষণিক নিজ উদ্‌যোগে বই আকারে সেটি প্রকাশ করার আগ্রহ জানিয়ে রাখতে ভুললাম না। আর কী আশ্চর্য, আমাকে অবাক করে দিয়ে ওয়াহিদ ভাই বললেন, 'এই এক বই কেন, আমার সব বই আপনি প্রকাশ করবেন!' আল্লাহ তাকে সে প্রতিজ্ঞার ওপর অটুট রাখুন, এবং আমাকেও তাওফিক দান করুন, আমিন!

মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেব– যার বিমূর্ত ব্যক্তিত্বকে শব্দের পোশাকে ভাস্বর করে তোলার প্রচেষ্টা হিসেবে এ বইয়ের জন্ম, ওয়াহিদুর রহমানের এই নির্ঘুম ক্লেশ ও আমাদের প্রয়াস– তিনি আমার সরাসরি ওসতাদ না হলেও তার চেয়ে কম কিছু ছিলেন না। কিছু শব্দ ও বাক্যের জ্ঞান যাদের থেকে শিখি কেবল তারাই আমাদের ওসতাদ, এমন নয়। দুনিয়ার যাবতীয় শব্দ যে ভৌত জগতের ফাঁপা রহস্য উন্মোচন করতে ব্যস্ত, তার অন্তরালের অদৃষ্ট সত্যকে সহসা যাদের চোখের দীপ্তিতে ফুটে উঠতে দেখি আমরা, তারাও আমাদের ওসতাদ। কখনো তাদের অবদান আমাদের জীবনে অন্য অনেকের চেয়েও বেশি হয়। মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেব এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার উপস্থিতি ক্ষণিকের জন্য এক অপার্থিব আলোড়ন তৈরি করত অর্ন্তজগতের অন্ধকার গলিতে। অন্য কথায়, যাকে দেখলে স্মরণ হয়ে যেত আল্লাহ, রাসুল ও পরকাল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবত এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কেই বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়!'[১] আমাদের সৌভাগ্য যে, এমন একজন ব্যাক্তিকে নিয়ে ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স তার প্রকাশনার যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলতে চাই, আমরা বইটিকে যথাসাধ্য সুন্দর ও নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কারও নিকট কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে, অবশ্যই আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। এখানে যা-কিছু উত্তম ও কল্যাণকর, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা-কিছু ত্রুটিপূর্ণ তা আমাদের উদাসীনতা ও শয়তানের

১. *সুনানু ইবনু মাজাহ*, হাদিস : ৪১১৯।

ওয়াসওয়াসার ফল। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, কাজটিকে তিনি কল্যাণকর করুন এবং আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে একে আমাদের নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করুন, আমিন!

বিনীত
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি ২০২২

শুরুর আগে

ভর দুপুর। আকাশে ঝাঁজালো রোদ। বার্ষিক পরীক্ষার সমারোহ শেষ করে বাসায় ফিরছি। হাত থেকে ব্যাগ রাখি নি তখনো, চকিতে দেখলাম আবু রাফআন সিরাজ ভাই একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা প্রেরণ করেছেন। খুলে দেখি শান্ত কণ্ঠে তিনি বলছেন,

> 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।
>
> আশা করি কুশলে আছেন। আগামী শাওয়ালের শেষে 'ইত্তিহাদে ফুজালা ও আবনা'র বার্ষিক অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। এবারের অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ মাদানীনগরের অগ্রগণ্য মরহুম তিন শায়খ তথা : শায়খ সন্দ্বীপী, শায়খুল হাদিস সাহেব ও আড়াইহাজার-হুজুর রহ.-এর ওপর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্‌যোগ গ্রহণ করেছেন।
>
> সত্বর এ ব্যাপারে ঘোষণা আসবে। তবে যেহেতু ঘোষণা দিলেই সকলে লেখেন না, তাই লেখকদের কাছে বিশেষ দাওয়াত পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে আজ একটি পরামর্শ সভা হয়। সেখানে আপনার নামও আসে। আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আড়াইহাজার-হুজুর রহ. সম্পর্কে আপনার যে স্মৃতি পরম্পরা আছে, তা লিপিবদ্ধ করা। কাজের সুবিধার্তে কয়েকটি শিরোনাম লেখা একটি কাগজ আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। ১০ রমজানের ভেতর আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল।'

বক্তব্যটি শুনে আমার উদ্বেলতা বেড়ে গেল। আবার সাথে পুলকও অনুভব করলাম। আড়াইহাজার-হুজুর রহ. ছিলেন আমাদের স্বপ্নপুরুষ, হৃদয়ের স্পন্দন। আদর্শ-পিতা। দরদি অভিভাবক। স্নেহশীল শিক্ষক। বাবা-মায়ের সোহাগ-শাসনের ফলিত রূপ তাঁর সাহচর্যে পাওয়া যেত। তাঁর প্রতিটি আচার-উচ্চারণ আমাদের হৃদয়-গহিনে প্রবল ছাপ রাখত। এমন ব্যক্তির স্মৃতিকথা লেখতে পারা সত্যিই বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার!

কিন্তু নিজের অক্ষমতা কাকে বোঝাব? আমি তাঁর অনেক পরের ছাত্র। তাঁর জীবনের মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ন, এবং অস্তের সময় পর্যন্ত যারা ছিলেন, এ ব্যাপারে তারা বেশি হকদার। আমি তো এসেছি তাঁর পড়ন্ত বেলায়। দুপুরের খরতাপ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল যখন। তাঁর জীবনের মধ্যদুপুরের রৌদ্রময় ইতিহাস তো আমার অজানা, এবং আমি জানি না তাঁর স্নিগ্ধ-প্রভাত ও নির্মল ঊষা। তাঁর অগণিত শ্রম-সাধনার প্রোজ্জ্বলতা।

কতদিন ল্যাপটপের সামনে উবু বসে আছি। লিখতে পারি নি একটি শব্দও। অথচ শব্দরা ছিল আমার প্রেয়সী। আমার জাগ্রত স্বপ্ন। বাক্যের প্রস্রবণ উগরে দেয় নি, নিতান্ত একটি বাক্য। অথচ বছরের পর বছর সে প্রস্রবণের বিমল বর্ণচ্ছটায় আমি ছিলাম সমৃদ্ধ। তখন মনে হলো ভেতরের উৎসমূল হয়তো শুকিয়ে গেছে। হয়তো ভাবমালা ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

জীবনের খেরোখাতা থেকে একটি করে দিন বিদায় নিচ্ছিল, আর আমি হুজুরের সম্বন্ধে শব্দমালা গোছাতে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার স্নিগ্ধ-প্রভাত, ঝাঁজালো দুপুর, শান্ত সন্ধ্যা আর

বিজন রাত সবকিছু একাকার হয়ে যাচ্ছিল। চারপাশের প্রিয় কোলাহল, বিপুলা তরঙ্গ, মায়াবী হাতছানি সব উপেক্ষিত হচ্ছিল।

তারপর রমজান মাসের কোনো এক ভোররাতে, আমি পেয়ে গেলাম আমার প্রথম বাক্য। তখন মনে হলো আমার শব্দ-প্রেয়সী, আমার ধূলিমলিন জীর্ণ শহরে পা রেখেছে। হয়তো গোলাপের পাপড়ি বিছিয়ে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে পারি নি, কিন্তু হৃদয়ের তপ্ত সিংহাসনে বসাতে কুণ্ঠাও বোধ করি নি! সে সময়ে আমার প্রতিটি সকাতর প্রার্থনা ছিল, 'দয়াময়, এ সমাপ্ত না করে যেন আমার মরণ না হয়!' তারপর একটানা দীর্ঘ আট মাস, বিস্ময়কর ঘোরলাগা উত্তেজিত মুহূর্তে আমি এ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করলাম।

আপন স্মৃতির সবটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হলাম না। বরং জানাশোনার ভেতর হুজুরের ব্যাপারে যা লেখা হয়েছে, এমন সবকিছুই সংগ্রহ করলাম। এ ক্ষেত্রে হুজুরের ছেলে ওবায়দুর রহমানের ভালোবাসা ও আগ্রহ ছিল অপূর্ব। চেষ্টা করলাম, হুজুরের ব্যাপারে সীমিত যা আছে, তার শ্রেষ্ঠাংশ তুলে আনতে। জানি না, হুজুরকে নিয়ে অন্য কেউ লিখবেন কী না? বাবারা তো আমাদের গল্পে থাকেন না। তাঁদের অমূল্য কীর্তিগুলো পুত্ররা না রাখলে, কারই-বা এমন ঠেকা আছে! এভাবে কতজন হারিয়ে গেছেন, আরও কতজন হারিয়ে যাবেন!

একদিন প্রিয় হানিফ আল-হাদী ভাই ফোন করে বললেন, 'চেষ্টা করুন, বিস্তারিত লেখতে!' তখন ভরসা পেলাম। সাহস বেড়ে গেল। আরও তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করলাম, এবং সেগুলো প্রয়োজনীয় সম্পাদনায় বিন্যস্ত করে ফেললাম। এসব সম্পাদনায় কখনো কখনো বক্তব্যের মূলভাব না পাল্টিয়ে পুরো অনুচ্ছেদটিকে নতুন করে ভাষা দিতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, লেখক লিখে গেছেন, পুনরায় দৃষ্টি ফেরাতে পারেন নি। তবে হ্যাঁ, কোনো অবস্থাতেই মূল তথ্যের বিকৃতি ঘটানো হয় নি।

আসলে বড় কথা হলো, যখন একনিষ্ঠ মনে কিছু চাওয়া হয়, তখন আল্লাহ সেটি দিয়েই দেন। এ পাণ্ডুলিপি তৈরির প্রতিটি পদক্ষেপে আমি তাঁর অসামান্য সাহায্য লাভ করেছি। বিশেষকরে হুজুরের নিজের লেখাগুলো পাওয়া তো ছিল তাঁর বিশেষ রহমত। তা ছাড়া মুফতি ফরিদ আড়াইহাজারির পাণ্ডুলিপিটাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুনশী মহিউদ্দিন ভাইয়ের লেখা থেকেও বিশেষ উপকৃত হয়েছি। রাফআত পাশার লেখা আর সাজ্জাদের স্মারকটাও খুব কাজ দিয়েছে। সবগুলোর উদ্ধৃতি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। *আজকের ইসলাহী জোড়ে* দেওয়া হুজুরের দুটো সাক্ষাৎকারও নিয়েছি। এ ছাড়া আরও কয়েকটি জায়গা থেকেও তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। যার উল্লেখ যথাস্থানে রয়েছে।

জীবন-প্রভাতে প্রতিজ্ঞা ছিল অনুবাদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করব না। এখন সমাজে যেভাবে অনুবাদ সাহিত্যের ভেলা চালিয়ে রাতারাতি 'তারকাখ্যাতি' চলে আসছে, তাতে আমার খুব ভয় হয়। আমি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। তাই বলে একেবারে অনুবাদনির্ভর হতে হবে, তাও স্বীকার করি না। কারণ এর মাধ্যমে কোনো জাতির সত্তাগত বিকাশ ঘটতে পারে না। তা ছাড়া যেভাবে অনুবাদ-প্রতিযোগিতা চলছে, তাতে বিশেষ শ্লাঘারও কিছু পাই না।

মূলত শিক্ষার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি না থাকলে, এবং শুধু 'কোনোমতে' স্তরের পড়াশোনা চলতে থাকলে, এমনই হওয়ার কথা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আসবে। কিন্তু নিজেদের শক্তি পরখ করার কাজ কেউ করবে না। আমাদের তো এ দোষ আছেই, বিদেশ থেকে আসা মানে অনেক কিছু। ঘরের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেওয়ার ফুরসত আমাদের কোথায়? যদি এর সাথে মৌলিক লেখার কাজও হতো, তাহলে হয়তো আরেকটু সমৃদ্ধি আসত। আমরা আরেক ধাপ এগিয়ে যেতাম।

সে যাইহোক, মাদানীনগর মাদরাসার 'ইত্তিহাদে ফুজালা ও আবনা'র দায়িত্বশীল আমার সকল সম্মানিত আসাতিজায়ে কেরামের অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁদের দুআ, ভালোবাসা, আন্তরিকতা না থাকলে আমার এটুকু লেখা সম্ভব হতো না।

এ কথা নির্দ্বিধাই বলা যায়, আড়াইহাজার-হুজুর রহ-এর ব্যাপারে আরও অনেক কিছু লেখার আছে। আমি কতটুকুই-বা লিখতে পারলাম! তাঁর জীবনের ১ হাজার ভাগের একভাগ হয়তো। বাকি রয়ে গেছে আরও নয়শ ৯৯ ভাগ। আশা করি, হুজুরের একান্ত শাগরিদগণ এগিয়ে আসবেন। শুধু হুজুরের জীবনীই নয়, বরং আমাদের সকল বড় ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম নিয়ে কাজ করতে হবে। পরবর্তীদের বেড়ে উঠতে বিনীত সাহায্য করতে হবে।

সবশেষে প্রিয় ইমরান রাইহান ভাইয়ের ভালোবাসার কথা স্মরণ করছি। তার দীর্ঘদিনের প্রেমময় তাকাদা আমাকে অনেক অনুপ্রাণীত করেছে। ফাউন্টেন পাবলিকেশন্সের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। নবীন প্রকাশক দাখিল ভাই অত্যন্ত আগ্রহভরে বইটি প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন, যার কোনো তুলনা হয় না।

নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বইটিতে বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি রয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় মুদ্রণে আন্তরিক চেষ্টা থাকবে সেগুলো সংশোধন করে নেওয়ার, ইনশাআল্লাহ।

দুআর মুহতাজ
ওয়াহিদুর রহমান
২৯ জুমাদাল উলা ১৪৪৩ হিজরি ।। ১৯ পৌষ ১৪২৮ বাংলা
৩ জানুয়ারি ২০২২ ইসায়ি ।। সোমবার ।। রাত : ৩টা ২৩ মিনিট

সূচনা

সুখদ, প্রাণদ ও প্রত্যয়ী স্মৃতিগুলো যখন অস্তিত্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তখন আমার মনে পড়ে যায় কৈশোরের স্বর্ণালী দিনগুলোর কথা! আমার দিগন্ত-বিস্তৃত হৃদয়াকাশে দীপিত হতে থাকে হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ.-এর সুমহান ব্যক্তিত্ব, আর তাঁর প্রজ্ঞাসুলভ সোহাগ-শাসন। কতভাবেই না তিনি আমাদের হৃদয়ের বাদশাহ ছিলেন! তাঁর বিনীত-গম্ভীর বিপুল সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের সামনে আমরা ভুলে যেতাম পার্থিব জীবনের ক্ষয়শীল অভিলাষ। মনে হতো জীবন মানেই হলো, দীনের জন্য সবকিছু কুরবান করে দেওয়া। মাদরাসার বিভিন্ন বিরতিতে বাড়ি যাওয়ার সময় উপদেশ দিয়ে বলতেন, 'মানুষকে দীন বোঝাও! জাহিলিয়্যাত ধীরে ধীরে এমনিই বিলীন হয়ে যাবে!'

জীবনে হয়তো তিনি বেশি কিছু লিখে যেতে পারেন নি; কিন্তু আপন জীবন গড়েছিলেন পুরোপুরি পূর্বসূরি মনীষীদের উপমায়! কথাবার্তা, আচার-আচরণ, আয়-উপার্জন এককথায় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ও নিবেদিত ছন্দে, তাঁকে দেখে পরকালের কথা স্মরণ হতো! তাঁর বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা ছিল প্রবাদতুল্য। মাদরাসার মূল ফটকের পাশে রুম থাকার কারণে ভেতর-বাহিরের প্রতিটি গমন-প্রত্যাগমন ছিল তাঁর নখদর্পণে। যেন আতশকাচে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি স্থির নিরীক্ষা করছেন। একদিন দরসে আমাদের বললেন, 'এখান দিয়ে কোন পা, কোন দিকে যায়, আমি শুধু পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারব!' এ ছিল তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত ফিরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টি! যা তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের দিয়ে থাকেন।

আমার এ নগণ্য জীবনে পরম সৌভাগ্য, জীবন-প্রভাতে আমি হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ.-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। হাঁটুগেড়ে তাঁর সামনে বসতে পেরেছিলাম! তাঁকে সবক শোনাতে পেরেছিলাম! প্রাণভরে তাঁকে অনুভব করতে পেরেছিলাম! তাঁর অসামান্য সৌরভমাখা সান্নিধ্য অর্জন করতে পেরেছিলাম!

১৪২৮ হিজরি মোতাবেক ২০০৮ সালে যখন মাদানীনগরে ভর্তি হতে আসি, তখন তিনি মসজিদের উত্তরপাশে চেয়ারে বসেছিলেন। আগত ছাত্রদের বাহ্যিক বেশভূষা তথা 'ওয়াজা-কাতা' যাচাই করছিলেন। দূর থেকে তাঁর আলো ঝলমল সম্মোহনী চেহারা দেখে অনেকেই স্তম্ভিত হচ্ছিল। কেউ কেউ অপার্থিব ব্যক্তিত্ব-বিভা দেখে পুলকও অনুভব করছিল। অগত্যা আমার পাশে একজন ইতিউতি জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'কে উনি?' তখন কেউ একজন পেছন থেকে জনান্তিকরূপে বলে উঠল, 'উনি হলেন আড়াইহাজার-হুজুর!'

আমাদের বয়স কতই-বা হবে তখন! ওই ছেলে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কি দাওরায় দরস করেন?' যে আগে উত্তর দিয়েছিল সে বলল, 'না, তিনি উর্দু-কায়েদা পড়ান।' প্রশ্নকারী খানিক বিব্রত হলো মনে হয়। সে হয়তো ভেবেছিল, এমন ব্যক্তি দাওরায় দরস না নিলে কে নেবেন? তখন কী জানি কেমন করে, যেন-বা খুব অজান্তে অস্ফুট বলে ফেললাম, 'শোনেন, সবাইকেই দাওরায় দরস নিতে হবে এমন কোনো বিধান নেই। কেউ পাঠদানের মাধ্যমে মাদরাসাকে পূর্ণতা দেবেন, কেউ ছাত্রদের গঠনের মাধ্যমে পূর্ণতা দেবেন, এবং কেউ কেউ আর্থিক ফিকিরের মাধ্যমে পূর্ণতা দেবেন। সব মিলিয়েই মাদরাসা। তাই ওসতাদ হিসেবে সকলেই সম্মানযোগ্য, শ্রদ্ধারপাত্র, মাথার মুকুট।'

আজ এতকাল পরে একান্তে বসে ভাবি, সেদিন কী করে এ কথা বলে ফেললাম! কেমন করে আমার মুখ দিয়ে এ উত্তর বেরিয়ে এল! সকল প্রশংসা কেবল তোমার জন্য হে আল্লাহ!

হুজুর দীর্ঘদিন উর্দু-কায়েদা পড়িয়েছিলেন। তবে ওই পড়ানোকে শুধুই পড়ানো বললে ভুল হবে। এই একটি দরসের মাধ্যমে হুজুর একজন শিক্ষার্থীর হৃদয়ে স্থান করে নিতেন। আগামীদিনের নবির ওয়ারিস হিসেবে তার কর্তব্য বুঝিয়ে দিতেন। করণীয় নির্ধারণ করে দিতেন। যেন তার অন্তকরণে নিরলস এ সবক পড়িয়ে দিচ্ছেন,

যে আকাশেই তুমি ডানা ঝাপটাও,
দিনশেষে নীড়ে ফিরে এসো!
যে তটেই তুমি নোঙর ফেলো,
মৃত্তিকায় তবে আশ্রয় নিয়ো!

হুজুরের রুমে কোনো ছাত্র প্রবেশ করলেই প্রথমে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটা, তীক্ষ্ম ও তীব্র দৃষ্টি দিয়ে পরখ করতেন এবং কোনো অসংগতি নজরে এলে তাৎক্ষণিক জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, এরপর কথা বলতেন। প্রথম দিনের সাক্ষাতে বিষয়টি বুঝেছিলাম। কোনো ছাত্র একদিনের জন্য হুজুরের কাছে পড়েছে আর হুজুর তাকে ভুলে গেছেন, এমনটি হতে পারত না।

এমনই এক ঘটনা। এক ছাত্র হুজুরের কাছে নিজের বিভিন্ন হালত জানাত। নিয়মিত হুজুরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হতো। হঠাৎ কী কারণে যেন হুজুরের সাথে তার সম্পর্কে শিথিলতা প্রাধান্য পেয়ে ফেলে। সে হয়তো অনেকদিন হুজুরের সামনে উপস্থিত হয় নি; এ কারণে বোধহয়। ওদিকে ভেতরে তার ইতস্ততা ক্রমপীড়া বাড়ায়। দিন যায়, রাত নামে, সময় আপন আবহে এগিয়ে চলে। এরই মাঝে সে পুনঃসাক্ষাতের ব্যাপারে অচেতন হয়ে যায়।

আর ঠিক তখনই একদিন হুজুর তাকে সালাম পাঠালেন। সালাম পেয়ে তো তার মাথায় আকাশ ফেটে পড়ে। তার নিটোল স্থিরতায় চাঞ্চল্য যেন অস্থির বিকিরণ ছড়াতে শুরু করল! মনে মনে সে ভাবতে থাকে, হুজুর যখন নিজেই ডেকে পাঠিয়েছেন, তাহলে না যাবার কোনো বাহানা উপায় খুঁজে দেবে না। আবার এখন গেলেও-বা কী বলবেন, তাও ভেবে কূল পায় না! পরন্তু ইত্যকার জটিলসব প্রশ্নের ধকলে তার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়, হয়ে পড়ে তটস্থ। অগত্যা দ্বন্দ্ব-মধুরতার এমন আলো-আঁধারীর দোলাচালে সে উপস্থিত হয় হুজুরের সামনে। তখন হুজুর তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

'আপনার মর্যাদা তো আকাশচুম্বী! তাই সালাম পাঠালাম, ডাক দিলাম না। দয়া করে জামাত আর ভর্তি নিবন্ধন নম্বর দিয়ে গেলে সামনে থেকে আমি নিজেই দেখা করতে যাব!' এ শুনে সে তো যারপরনাই লজ্জিত। শরমে কাঁচুমাচু। মাথা অবনত করে পারে না তা পেটের ভেতর দাফন করে দেবে![২] হ্যাঁ, এমনই ছিল হুজুরের তারবিয়াতের প্রেমময় পরশ! এই তো ইনতিকালের কিছুদিন আগেও ওপরের দিকের কয়েকজন ছাত্র কোনো কারণে মাদানীনগর ছেড়ে অন্যত্র যায়। খবর পেয়ে হুজুর তাদের মুখ্য একজনকে ফোনে বললেন, 'আপনারা আসবেন, নাকি আমি আসব?' এ কথা শুনে কার সাধ্য আছে তা উপেক্ষা করার?

২. হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ. : সীমাহীন দিগন্তের দিকে -রাফআত পাশা। প্রকাশ : মাসিক *দারুল উলুম*, শাবান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক এপ্রিল ২০১৬ ইসায়ি। পৃষ্ঠা : ৪-৫।

অনেক উদাস ও অনুদ্যমী ছাত্র, যারা বিভিন্ন কারণে ইলমে-দীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ত, তাদের কাউকে কখনো দুআ করে, কখনো দাওয়া দিয়ে, কখনো শাসন করে, কখনো আদর দেখিয়ে, এককথায় কৌশলে ও মমতায় তাদেরকে হৃদয়ে সংযুক্ত করে নিতেন। হুজুরের এইসব প্রাজ্ঞতা আজও আমাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

অরেকটি ঘটনা। এক ছাত্র, আছে না 'লাল-বিল্ডিং', ওখানে প্রতিনিয়ত 'রঙিন আলো' দেখতে যেত! একদিন হুজুর তাকে রুমে ডাকলেন। সে রুমে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আল্লাহ তাআলা হুজুরকে আশ্চর্য প্রভাব ক্ষমতা দিয়েছিলেন। হুজুরের রুমে প্রবেশ করলেই ভালোবাসা-মিশ্রিত ভয় কাজ করত, এবং ধুলিমাখা-হৃদয় সতত পরিশুদ্ধির প্রান্তরে প্রবলবেগে যাত্রা করত। হুজুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীরে, কেমন আছিস?' সে আমতা আমতা করতে লাগল। ঠিক বুঝে উঠতে পারর না, কী ঘটতে যাচ্ছে! হুজুর বললেন, 'বুঝছিস, আগামীতে ওখানে যাওয়ার আগে আমার থেকে অনুমতি নিয়ে যাবি! আর শোন, টাকাটাও কিন্তু আমার পকেট থেকে নিবি!' এ কথা শুনে ওর কলিজার পানি দিব্যি শুকিয়ে যায়! সে ভেবে কূল পায় না, হুজুর জানলেন কী করে? তারপর অনুতাপে-অনুশোচনায় হুজুরের পায়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে![৩] এ ছিল হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ.-এর দীক্ষাদানের অপূর্ব নমুনা। শুধু হুজুরের দীক্ষাদানের গল্পগুলো একত্র করলে, স্বতন্ত্র পুস্তিকা হয়ে যাবে!

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪।

তিনি ছিলেন আত্মার-আত্মীয়

কোনো কোনো ঋণ আছে শোধ করা যায় না। শোধ করব কী, চিহ্নিত করাই অসম্ভব! ওসতাদে মুহতারাম হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ.-এর কাছে আমাদের ঋণ ছিল ওই রকমের। চিহ্নিত করা যাবে না, শোধ করার তো প্রশ্নই আসে না। আর আমাদের সমষ্টিগত ঋণের কথা তো বলাই বাহুল্য। যা চির অপরিশোধ্য ও গভীর। গতরের চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দেবার প্রবাদ সত্য প্রমাণিত করেও কী ওই ঋণশোধের ধারে-কাছে পৌঁছা যাবে? কত ছাত্রকে তিনি মানুষ করেছেন, মায়ের সোহাগ আর বাবার শাসন দিয়ে প্রতিপালন করেছেন, তার কী কোনো হিসেব আছে?

একবার এক ছাত্র সিদ্ধান্ত নিল মাদরাসায় পড়বে না। হুজুর তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, কেন চলে যাচ্ছ?' সে বলল, 'হুজুর, আমার কিছু কাজ আছে। যেগুলো আঞ্জাম দিতে অনেক টাকা দরকার। টাকা উপার্জন করে আমি প্রয়োজন পূরণ করতে চাই!' হুজুর বললেন, 'টাকার ব্যবস্থা যদি আমি করি, তাহলে কি তুমি মাদরাসায় থাকবে?' সে বলল, 'জি।' এরপর যখনই ছেলেটি টাকা চাইত, হুজুর দিয়ে দিতেন। এভাবে চলতে থাকে।

একসময় ছেলেটি জালালাইন জামাতে ওঠে, তখন আপন কর্মের জন্য তার খুব অনুশোচনা হয়। হুজুরের কাছে এসে সে শিশুর মতো কান্না জুড়ে দেয়। হুজুর তাকে মাফ করে দেন। তারপর সে পূর্ণ-উদ্যমে লেখাপড়া করে যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম হয়।[৪]

হুজুর গোটা জীবন আপন শায়খ ও মুরশিদ, মুসলিহে উম্মত হজরত মাওলানা ইদরিস সন্দীপী রহ. (১৩৫০-১৪২৩ হিজরি)-এর সোহবতে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। হজরত রহ.-কে এমনভাবে মান্য করতেন, যার উপমা দিতে জগৎ অক্ষম হয়ে গেছে। মুফতি আমিনী রহ. (১৩৬৪-১৪৩৪ হিজরি) যখন হুজুরকে বলেছিলেন, 'আবদুল আউয়াল, তুমি আমার কাছে থেকে যাও!' হুজুর তখন বললেন, 'হজরত, আমি তো নিজেকে সন্দীপের হজরতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি!'[৫]

হুজুরের মেজ ছেলে যখন দুনিয়াতে আসে, তখন মা-বেটার অবস্থা ছিল খুবই সংকটপূর্ণ। ওদিকে পরদিন মাদরাসার জরুরি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য হজরত রহ. আড়াইহাজার-হুজুরকে মাদরাসায় অবস্থান করে দুআ করে যেতে বললেন। হজরত রহ.-এর কথামতো হুজুর মাদরাসার কাজে ব্যস্ত থেকে দুআ করতে থাকেন। বাকি মা-বেটার সংবাদ শোনার পর মন কিছুটা খারাপ। মাগরিবের পর হজরত ডেকে বললেন, 'যাও, তাদের দেখে আস! তবে ফজরের আগে চলে আসবে!'

হুজুর অনেক রাতে বাসায় পৌঁছালেন। কী করুণ অবস্থা তখন মা-বেটার! এ চরম মুহূর্তেও হুজুর অল্প সময়ে দেখা-সাক্ষাৎ শেষ করে ফজরের নামাজ চিটাগাংরোডে এসে আদায় করলেন। নামাজের সময় এখানে হয়ে যায় তাই। চিটাগাংরোড থেকে মাদরাসায় প্রবেশের সময় দেখলেন, মুসল্লিরা বের হচ্ছে আর তাদের চোখে-মুখে কান্নার ছাপ। এ দৃশ্য দেখে হুজুর কিছুটা ভয় পেয়ে যান! এক মুসল্লিকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'হজরতের এক খাস শাগরিদের সন্তান খুবই অসুস্থ। হজরত সবাইকে

---

৪. মাদানীনগর মাদরাসা ঢাকা'র প্রবীণ উস্তায হযরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রাহ. : চলে গেলেন হাজারো তালেবানে ইলমের 'দরদি উস্তায' -আবু মাইসারা মুনশী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন। প্রকাশ : মাসিক *আলকাউসার*, শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক জুলাই ২০১৬ ইসায়ি। পৃষ্ঠা : ২৮।

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৭।

নিয়ে তার জন্য খুব কান্নাকাটি করে দুআ করেছেন।'[৬] এ শুনে হুজুরের চোখ দরদর করে ওঠে! হ্যাঁ, এ ছিল হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ.-এর কুরবানি ও আত্মোৎসর্গের নমুনা! যা আমাদেরকে শুধু ইবরাহিমি কুরবানির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়!

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৭।

তাঁর সবকের মোহন সৌরভ

তাঁর কাছে আমরা ১৪২৮-১৪২৯ হিজরি মোতাবেক ২০০৮-২০০৯ ইসায়িতে উর্দু-কায়েদা পড়েছিলাম। মাদানীনগরে তাঁর দরসই ছিল আমাদের প্রথম দরস। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ পরিমাণ বিচক্ষণতা ও যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, তিনি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে হাত ধরে-ধরে মানুষ বানাতেন। তাঁর বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যিনি শিক্ষার্থীদের শুধু সবক পড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, বরং তার চরিত্র-গঠনের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল থাকতেন। যেন সে আলেম হওয়ার সাথে সাথে উত্তম চরিত্রের অধিকারীও হতে পারে।

রিমান্ডে জালেমদের নির্যাতনের কারণে তাঁর পায়ে ব্যথা ছিল! তাই আমাদের বিভাগীয় রুমে এসে দরস করতে পারতেন না। আমরা তাঁর রুমে গিয়ে দরস করতাম। আমার মনে পড়ে, পুরো বছরে মাত্র একবার হুজুর আমাদের বিভাগীয় কক্ষে ক্লাস করতে পেরেছেন।

কখনো কখনো হুজুর অত্যধিক অসুস্থতার কারণে শুয়ে আছেন, কোনো ছাত্র দূরে বসে ফিসফিস করছে। হুজুর শুনে ফেলতেন এবং তৎক্ষণাৎ বলতেন, 'অমুক কথা বলছেন!' দরসে হুজুর কোনো হেকায়েত শোনাচ্ছেন, কেউ হয়তো সে হেকায়েত আগ থেকে শুনেছিল। সে পেছনে বসে আশপাশের ছাত্রদের হেকায়েতটির পরবর্তী অংশ মুখে মুখে বলছে, হুজুর তৎক্ষণাৎ কথা বন্ধ করে দিয়ে বলতেন, 'বাকিটুকু অমুক ভাই থেকে শুনে নেবেন!'

হুজুর অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সামান্য অন্যায্য সহ্য করতে পারতেন না। তবে মন ছিল খুব নরোম। বাইরে যত কঠোর মনে হতো, ভেতরে তত মোলায়েম। বাহ্যিকভাবে তাঁর মাঝে সিফাতে জামালের (প্রীতি) ওপর সিফাতে জালাল (ভীতি) প্রাধান্য পেয়েছিল। *সুনানে তিরমিজি*তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে না,

مَن رآهُ بَدِيهةً هابَهُ، ومَن خالَطَهُ مَعرِفَةً أحَبَّهُ.

অর্থ : যে তাঁকে হঠাৎ দেখে, সে ভয় পেয়ে যায়, আর যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশে, সে ভালোবাসতে শুরু করে।[৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বৈশিষ্ট্যটি হুজুরের মাঝে বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া দরসে সকলেই মনে করত, হুজুর আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন! এটিও যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে আদর্শের বাস্তবায়ন, যেখানে সকল সাহাবি মনে করতেন, রাসুল আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন!

মাদরাসায় আসার পর হুজুর, ছোট শিক্ষার্থীদের মা-বাবার অনুপস্থিতি অনুভব হতে দিতেন না। আমাদেরকে একবার দরসে বলেছিলেন, 'যখন মক্তব বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম, আমার খাটের সামনে সাদা পর্দা টাঙানো ছিল। রাতে মামুলাত আদায় করে চোখ বন্ধ করতাম, ঘুমাতাম না। কোনো বাচ্চা হঠাৎ পানি বলে আওয়াজ করলে, পানি নিয়ে তার কাছে যেতাম। কারও হাজতের প্রয়োজন হলে, হাজতখানায় নিয়ে যেতাম!'

৭. *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস : ৩৬৩৮।

হুজুরের ইনতিকালের পর মাদরাসার উত্তরপাশের ভবনে দুই হাউজের মধ্যভাগে খাটিয়া রাখা। শেষ নজর দেখার জন্য চারপাশে মিছিলের ভীড়। এরই মাঝে দুজন যুবক শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। একজনের মুখে খোঁচা-দাড়ি। অপরজন দাড়িশূন্য। স্বল্পরেশী যুবকটি ফোঁটা-ফোঁটা কাঁদছে। অন্যজন কপট রেগে বলল, 'কীরে কাঁদিস ক্যান? এই লোক তোর কে হয়?' সে বলল, 'ইনি আমার আত্মীয় হন না বটে, কিন্তু আমার আপনজনের চেয়েও আপনজন! আমি ছোট থাকতে এই মাদরাসায় পড়তাম। এই যে হাউজদুটি দেখছিস, এখানে আগে ঘাটলা ছিল। এই ঘাটলায় ইনি আমার জামা-কাপড় কতবার ধুয়ে দিছে, তার কোনো হিসাব আছে?! প্রস্রাব করে দিতাম, এই লোক আমাকে পরিষ্কার করে দিত! আজ আমি কাঁদব না তো কে কাঁদবে?[৮] সে যুবক এ কথাগুলো বলছিল, আর তার চোখের ফোঁটাগুলো হৃদয়ের কাতরতার মিশেলে দীর্ঘতর হচ্ছিল!

হুজুরের এইসব প্রেমময় অশ্রুকাব্য শুনলে মনটা অস্থির হয়ে পড়ে। জগতের সবকিছু ঝাঁপসা লাগে! তারপরও এইসব ঘটনা অতি সামান্য। সাধনার যে বিশাল মানচিত্রে হুজুরের বসবাস, তার বিবরণ এ ক্ষুদ্র রচনায় আনা সুইয়ের ভেতর উট নেওয়ার পরিকল্পনা যেন। আবু তাম্মামের (১৮৮-২১৩ হিজরি) ভাষায় বলতে হয়,

هَيْهاتَ لا يَأْتِي الزَّمانُ بِمِثْلِه، إِنَّ الزَّمانَ بِمِثْلِه لَبَخيلُ.

অর্থ : জামানায় তার অনুরূপ আসা দুষ্কর হয়ে পড়েছে,

কেননা, সময় তার অনুরূপ পেশ করতে বড় কৃপণ।

আমি বরাবর হুজুরের ভেতর শায়খুল ইসলাম হজরত মাদানি রহ.-কে (১২৯৬-১৩৭৭ হিজরি) দেখতাম। খেদমত, পরোপকার, নিজেকে গোপন করা, মেহমানদারি, বিনয়, অল্পেতুষ্টতা, দীনের জন্য সবকিছু পরিত্যাগ করা ইত্যাদি সবদিক থেকেই হজরত মাদানির সাথে হুজুরের মিল পেতাম। একদিন হুজুরকে বলেই ফেললাম, 'আপনার কামরায় এলে হজরত মাদানির ঘ্রাণ পাই!' হুজুর মুচকি হেসে বললেন, 'এটা তোর সুধারণা!'

৮. হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল রহ. : সীমাহীন দিগন্তের দিকে -রাফআত পাশা। প্রকাশ : মাসিক *দারুল উলুম*, শাবান ১৪৩৭ হিজরি মোতাবেক এপ্রিল ২০১৬ ইসায়ি। পৃষ্ঠা : ৫।

যেভাবে গড়ে তুললেন আমাদের

হুজুর সাধারণত ছাত্রদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। সেটা কোনো ভঙ্গি ছিল না; অনায়াসলব্ধ এবং ভেতর থেকে আসত ওই সম্বোধন। বয়স যা-ই হোক, জ্ঞানে যতই অপরিপক্ব থাকুক, হুজুরের কাছে সকলেই সমান ছিল। যেন-বা তাঁর-ই সমান তারা, তাই 'আপনি' বলে ডাকছেন। অবশ্য সু-সম্পর্ক কায়েম হলে 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন। হ্যাঁ, সেই 'তুই'য়ের মাঝে অঘ্রাণের বাতাবি লেবুর ঘ্রাণ ছিল। বুনোফুলের সলাজ কোমলতা থাকত। কাশফুলের শুভ্রতার ছোঁয়া থাকত। মনে মনে অনেকেই চাইত, হুজুর আমাকে 'তুই' বলে ডাকুক! হুজুরের 'তুই'-উচ্চারণে আত্মার আত্মীয়র আবেদন ছিল। অন্য রকম মায়া কাজ করত!

প্রথম যেদিন দরসে উপস্থিত হলাম। সকলকে দাঁড়িয়ে নাম-ঠিকানা বলতে বললেন এবং আগে কোথায় পড়েছেন, তাও জানাতে বললেন। দেখলাম, হুজুর প্রায় অনেক জেলার পাড়া-গ্রামসহ চেনেন। মাদরাসার প্রয়োজনে কিংবা মাহফিলের সুবাদে দেশের প্রায় অনেক জায়গায় সফর করেছেন হুজুরের, তাই এত পরিচিতি। তারপর পর্যায়ক্রমে পুরো বছরে *উর্দু-কায়েদা*, *উর্দু-পহেলি*, *উর্দু-দুসরি* এবং *তালিমুল ইসলামের* কিছু অংশের সবক পড়িয়েছিলেন। *তালিমুল ইসলাম* মূলত ওসতাদে মুহতারাম হজরত মাওলানা মুহিউদ্দীন সাহেব মাইজদি-হুজুর পড়াতেন। আড়াইহাজার-হুজুর অসুস্থ থাকলে মাইজদি-হুজুর হুজুরের সবক এগিয়ে নিয়ে যেতেন। আবার মাইজদি-হুজুরের কোনো ব্যস্ততা চলে এলে, আড়াইহাজার-হুজুর *তালিমুল ইসলাম* পড়িয়ে দিতেন। এ ছিল ভালোবাসা ও হৃদ্যতার অপূর্ব প্রকাশ! এ যুগে যা বিলুপ্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।

হুজুরের দরসের নিয়ম ছিল, প্রথমে একজন মূলপাঠ পড়বে, আর হুজুর অর্থ বলে দেবেন। কোনোটা বুঝে না আসলে অচিরেই বলে দেবেন। এভাবে এক-দুবার হয়ে গেলে সকলকে নিজ উদ্যেগে চার-পাঁচবার হালকা আওয়াজে পড়ে নিতে বলতেন। তারপর নিজ কামরায় গিয়ে তাকরার বা সম্মিলিত-পাঠের (Group study) মাধ্যমে সে সবক পুরোটা আয়ত্ত করে নিতে বলতেন। পরদিন সবাইকে পুরো সবক হুজুর যেভাবে বলেছেন, সেভাবে পড়ে শোনাতে হতো, এবং দোয়াত-কলমে মোটা কাগজে লিখে আনতে হতো। হুজুর প্রতিদিন সকলের খাতা দেখতেন। কোনো ভুল পেলে সংশোধন করে দিতেন। কওমি শিক্ষাধারার এ আশ্চর্য কুশলতা! এখানে ব্যাপক অর্থে কোনো শিক্ষা-বাণিজ্য নেই। 'টাকা যার শিক্ষা তার'– এ রকম কোনো দ্বিমুখী পুঁজিপূজার নীতি নেই। এখানে পুঁজির নিক্তিতে মাপা হয় না মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই ওই তাকরার বা (Group study)-এর মাধ্যমে আমাদের দরসের পড়া আয়ত্ত হয়ে যেত।

হুজুর দরসে খুব গম্ভীর হয়ে থাকতেন, তা অবশ্য নয়। মাঝে মাঝে মধুর রসিকতাও করতেন। নোয়াখালীর কোনো ছাত্র থাকলে তাকে বলতেন, 'তোদের দেশে পানিকে কী বলে রে?' সে অবচেতনে বলত, 'হানি।' পুরো দরসে চাপা হাসির রোল পড়ে যেত। তারপর হুজুর বলতেন, 'তাহলে পেপেকে কি বলিস তোরা?' সে বলত, 'হেহে।' এ শুনে ছাত্রদের চোখে-মুখে হাসির আলো দেখে কে? আবার বরিশালের কোনো ছেলে থাকলে তাকে বলত, 'তুই কি এ কবিতাটা বলতে পারিস?' সে মনে করত, পাঠ্যপুস্তকের কোনো কবিতা জিজ্ঞেস করবেন হয়তো! হুজুর বলতেন,

‘মোর বাড়ি বরিশাল, মোর দাদা ছহিদার, মোরে ছেনো...’ তখন সে মাথা নিচু করে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকত। আর ছাত্রদের সে কী উচ্ছ্বাস!

আমাদের সাথে মাদানীনগর মাদরাসার সম্মানিত নাজেমে তালিমাত ও শায়খে সানি, ওসতাদে মুহতারাম হজরত মাওলানা মুফতি আবদুল বারী সাহেবের ভাগিনা, আমাদের প্রিয় সাথি মাহবুব ভাইও পড়তেন। হুজুর তাকে ‘মামা’ বলে সম্বোধন করতেন। মাঝে মাঝে তাকে বলতেন, ‘মামার কাছ থেকে আগামীকাল দু পৃষ্ঠা দোয়াত-কলমে লেখা নিয়ে আসবেন, তারপর সে অনুযায়ী পুরো পৃষ্ঠা লেখে দেখাবেন।’ হুজুরের কথামতো সে লেখা এনে দেখাত। আপন মামার মতোই আল্লাহ তাআলা তাকে ভালো মেধা দিয়েছেন। অল্পসময়ই তার হাতের লেখা পরিষ্কার হয়ে যায়। আর পড়া তো সে পারতই। তাকরারের জিম্মাদার ছিল। আর সালাহউদ্দীন আহসান ভাইয়ের কথা কী বলব! তার আশ্চর্য এক প্রতিজ্ঞা ছিল। হুজুর তো চেয়ারে বসতেন, সে প্রতিদিন কী করে যেন একেবারে হুজুরের পায়ের কাছেই বসত। আমার মনে হয়, পুরো বছরে একবারের জন্যও কেউ তাকে ওই জায়গা থেকে সরাতে পারে নি। সারা বছর সে হুজুরের একেবারে পায়ের সামনেই বসেছে। তাকে পেছনে ফেলার মতো কেউ ছিল না।

হুজুর দরসে দুটো জিনিস মারাত্মক অপছন্দ করতেন। এক. হুজুরের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত পেছনে রাখা। তৎক্ষণাৎ হুজুর বলতেন, ‘আপনি কি চুরি করেছেন, হাত পেছনে কেন? চোর আর দারোয়ান হাত পেছনে রেখে কথা বলে, আপনি কোনটি?’ দুই. কথা বলতে বলতে উভয় ঠোঁট চাপ দিয়ে মুখের ভেতরের দিকে নিয়ে যাওয়া। হুজুর তখন ‘এই’ বলে এমন ধমক দিতেন, আমরা আঁতকে ওঠতাম! তা ছাড়া মাদরাসার রীতি মোতাবেক জুব্বার পরিবর্তে অন্য ধরনের জামা পরিধান করাও হুজুর পছন্দ করতেন না। নতুন ছাত্রদের কুরবানির ইদ পর্যন্ত সুযোগ দিতেন। এরপরও কেউ জুব্বা না পড়লে, রাগ করতেন। হুজুর বলতেন, ‘দেখেন, জুব্বা ছাড়া অন্য কোনো জামা পড়লে, শরয়ি দৃষ্টিকোণে নিষেধ নেই। দেওবন্দ থেকে আমাদের অনেক মুরুব্বি আসেন, তারাও পাঞ্জাবি পরিধান করেন। কিন্তু আপনারা যেহেতু শিক্ষার্থী, তাই মাদরাসার নিয়ম মেনে চলেন। জীবনে বড় হতে হলে, কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এটা আপনাদের আদর্শ জীবন গঠনের প্রশিক্ষণ হিসেবে মনে করবেন।’ আর টুপির ব্যাপারে হুজুরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এমন টুপি পরিধান করা, যা হবে সাদা রঙের, এবং মাথায় সার্বক্ষণিক লেগে থাকে। হুজুর বলতেন, ‘যে টুপিই পরেন, সাদা হওয়া চাই, এবং মাথায় লেগে থাকে এমন হওয়া চাই!’ রঙিন টুপি পরিধান করা একদম অপছন্দ করতেন। তা ছাড়া রঙিন টুপি পরা মাদরাসার নিয়ম বহির্ভূতও ছিল।

হুজুর ছাত্রদেরকে সবকিছুর আদব শেখাতেন। কথা বলার আদব। কথা শোনার আদব। খেদমত করার আদব। এমন কী হাম্মামখানার আদবও! এককথায় সুচারু জীবন চালনার আনুষাঙ্গিক সকল আদব। হুজুর বলতেন, ‘যা শেখার এখন শিখে নেন! বড় হয়ে গেলে, ওসতাদ হয়ে গেলে, কেউ শেখাতে আসবে না। তখন শুধু ভুল ধরবে, সংশোধন করবে না কেউই।’

ইমরান নামে হুজুরের একজন খাদেম ছিল। সে আমার ছোট ভাইদের সহপাঠী ছিল। হুজুরের খেদমত করত। একবার সে হুজুরের জন্য দস্তরখানা বিছাল। হাতধোয়ার জন্য চিলমচি সামনে দিল। কিন্তু তাতে ছিল ময়লা। এ দেখে হুজুর তাকে শাসালেন, ধমক দিলেন। সে সময় হুজুরের পাশে আবু তাহের সাহেব বসা ছিলেন। যাকে হুজুর শুধু নামের কারণে শ্রদ্ধা করতেন। কারণ হুজুরের বাবার নামও তা-ই ছিল। ইমরান চিলমচি পরিষ্কার করতে হাউজে গেল। এ সুযোগে হুজুর আবু তাহের সাহেবকে বললেন, ‘এই যে ছেলেটাকে ধমক দিলাম, তাতে তার শিক্ষা হয়েছে, এবং এ শিক্ষা তার মনেও থাকবে। এখন তো কেউ কাউকে শেখাতে চায় না। আমাদেরকে হজরত রহ. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিখিয়েছেন। তাকে আমি ধমক দিয়েছি, আবার তাহাজ্জুদের সময় তার জন্য দুআও

করব। যেন আল্লাহ পাক তাকে কবুল করে নেন!' আজ হৃদয়ের মণিকোঠায় হুজুরের সেইসব সোনামাখা স্মৃতি কত উজ্জ্বল হয়ে আছে!

বলছিলাম, দরসে হুজুরের রসিকতার কথা। তো হুজুর নোয়াখালী আর বরিশালের রসিকতা করে থেমে যেতেন না হুজুর। সেখানকার বড় বড় বুজুর্গদের কথাও বলতেন। তাদের সাধনার কথা বলতেন। বরিশালে সন্দ্বীপের হজরত রহ.-এর সফরের কারগুজারি শোনাতেন। সেখানে সাধারণ মানুষের কাছে কীভাবে দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, তাও বলতেন। তবে একটা কথা সবসময় স্মরণ করিয়ে দিতেন, 'বাবারা, যে যেখানেই থাকেন না কেন, আপন ওসতাদের কথা কখনো ভুলবেন না। স্বশরীরে কখনো আসতে না পারলে, দুআতে হলেও স্মরণ রাখবেন! আপনাদের কাছে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। ওসতাদেরকে সবসময় গনিমত (অপ্রত্যাশিত নিয়ামত) মনে করবেন। দেখবেন তাঁদের দুআর বরকতে জীবনে অনেক সমৃদ্ধি আসছে।'

একদিন সম্ভবত ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ। মাওলানা ইমদাদুল হক আড়াইহাজারি রহ. ইনতিকাল করেছিলেন। যথারীতি সকাল আটটা থেকে দরস চলছে। হঠাৎ হুজুর হেসে বললেন, 'আজকে না আড়াইহাজার-হুজুর ইনতিকাল করেছেন, তারপরও আপনারা দরসে আসলেন?' আমরা এদিক-সেদিক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম! কীরে, হুজুর কী বলছেন? একটু পর বুঝার বাকি রইল না, হুজুর ইমদাদুল হক আড়াইহাজারি রহ.-এর কথা বোঝাচ্ছেন। তারপর অল্পকথায় তাঁর কিছু হেকায়েত শোনালেন মনে হয়।

মাঝে মাঝে হুজুর সন্দ্বীপের হজরত রহ.-এর স্মৃতিচারণ করতেন। বলতেন, হজরতের জীবন ছিল, *পান্দেনামা* আর *গুলিস্তার* মতো। হজরত মুজাজ (খলিফা) ছিলেন মাদানি রহ.-এর; কিন্তু মেজাজ (স্বভাব) ছিল থানবি রহ.-এর। উভয় শায়খের ব্যাপারে হজরত কোনো ভিন্নতা তৈরি করতেন না। বলতেন, হজরত থানবি আমার মাথার ওপর, আর হজরত মাদানি আমার বুকের ভেতর! [৯]

সারা জীবন আমরা দেখেছি, হজরত কোনো বে-ইনতেজামি সহ্য করতেন না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, পুরো মাদরাসায় নিজে ঘুরে ঘুরে তদারকি করতেন। হাতের লাঠি দিয়ে যে জায়গায় আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না, সেখানে হজরত অপরিচ্ছন্নতা পেয়ে যেতেন। এখন তো নতুন মসজিদ হয়ে গেছে, হজরত ওই সময় মসজিদের দেয়ালে সকলের স্মরণের জন্য লিখে দিয়েছিলেন, اَلنَّظَافَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ।

জীবনে কোনোদিন হুজুরের মুখে হজরত রহ.-এর নাম উচ্চারণ করতে দেখি নি। একবারও না। সবসময় বলতেন, আমার হজরত বা সন্দ্বীপের হজরত রহ.। একদিন হুজুরের রুম সাফাইকালে কোথা থেকে যেন হজরত রহ.-এর অনেক পুরোনো শীর্ণ একটি ছবি বের হয়। দূর থেকে হুজুর সেটি দেখে শিশুর-মতো কান্না করে দেন। আবার সাথে সাথে ছবিটি ঝুড়িতেও ফেলে দেন। আমার সাথে তখন হুজুরের খাদেম মেহেরপুরের ইমরান ভাই ছিলেন। সেসময় হুজুরকে দেখে মনে হলো, তিনি

---

৯. এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আড়াইহাজার-হুজুর রহ.ও সমাজে প্রচলিত মাসলাক কেন্দ্রিক কোলাহল বিলকুল অপছন্দ করতেন। যতদূর মনে হয়, হুজুর এগুলোকে حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ তথা : 'অজ্ঞতার আত্মম্ভরিতা' ভাবতেন। শুধু আড়াইহাজার-হুজুরই নয়, মাদরাসার অন্য কোনো ওসতাদের মাঝেও এসব প্রান্তিক চিন্তা প্রবহমান ছিল না। সত্য বলতে কী, কোনো ঘারানারই বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মাঝে এমন চিন্তা থাকে না। যাদের চিন্তা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি নেই, তারাই এমনসব অকোজো চিন্তায় আটকে থাকেন। আড়াইহাজার-হুজুরকে দেখেছি, সকল ঘারানার মুরুব্বি ও বুজুর্গদের শ্রদ্ধা করতেন।

একবার মাদরাসায় হজরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী হুজুর রহ. (১৩৬৭-১৪৩৮ হিজরি) তাশরিফ আনলেন। তখন হুজুরকে দেখলাম, দৌড়িয়ে গেছেন হজরতের খেদমতে। আমি তখন নাহবেমির জামাতে পড়ি। হারদুয়ির হজরত মাওলানা আবরারুল হক রহ. (১৩৩৯-১৪২৬ হিজরি) -এর বাণী-সংবলিত একটি কাগজ, যাতে কুরআনের আদব ও সুন্নতের পাবন্দি ও ওলামায়ে কেরামকে সম্বোধন করে কিছু কথা লেখা, সেটি হুজুরের রুমে টাঙানো ছিল। অথচ হারদুয়ির হজরত ছিলেন হজরত থানবি রহ. (১২৮০-১৩৬২ হিজরি)-এর খলিফা। মোটকথা, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা, এটিই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ।

আপন শায়খের খেদমতে সবকিছুই কুরবান করে দিয়েছেন। তাই এখন এতটা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন।

আমাদের ওসতাদ হজরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান নাজেম-সাহেব হুজুর আর আড়াইহাজার-হুজুর রহ.-কে সারা জীবন দেখেছি, তাঁদের সামনে কোনো প্রসঙ্গে সন্দ্বীপের হজরত রহ.-এর নাম উচ্চারিত হলে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চোখে পানি চলে আসত, যেন কলকল রবে বয়ে চলা স্রোতস্বিনী। আমার চোখে এখনো সে দৃশ্য ভাসে, মাদরাসার মাঠে হজরত মাওলানা নুরুল ইসলাম রহ. (১৩৬৭-১৪৪৩ হিজরি)-এর রচিত, সন্দ্বীপের হজরতকে নিয়ে লেখা মর্সিয়া তাঁর ছেলে খালেদ ভাই পাঠ করছেন, আর আড়াইহাজার-হুজুর মসজিদের একটি পিলারের কোণে নিভৃত দাঁড়িয়ে আছেন। তিন কি চার চরণ আবৃত্তি শেষ না হতেই হুজুর চোখ মুছতে মুছতে রুমে চলে যাচ্ছেন। একবারের জন্যও পেছনে ফেরে দেখছেন না। এমন কি পুরো মর্সিয়া শেষ হওয়ারও অপেক্ষা করছেন না। চলে যাচ্ছেন। শায়খের ভালোবাসার বেদনা যেন তাঁকে স্থির হতে দিচ্ছে না!

মাঝে মাঝে হুজুর আমাদেরকে শায়খুল ইসলাম হজরত মাদানি রহ.-এর আত্মত্যাগের গল্পগুলো শোনাতেন। ইংরেজ-খেদাও আন্দোলনে হজরতের কুরবানির কথাগুলো বলতেন। শায়খুল হিন্দ রহ.-এর খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়ার হেকায়েতগুলোও শুনাতেন। তা ছাড়া হজরত মাদানির প্রসিদ্ধ সে উক্তিটি কতবার যে হুজুরের মুখে শুনেছি,

مانو، تو مانے گا، اگر نہیں مانو، تو نہیں مانے گا، یہاں تک کہ بچہ نہیں مانے گا، گھر کی بیوی نہیں مانے گی، اور پالا ہوا کتا بھی نہیں مانے گا۔

অর্থ : মানো, তাহলে মানবে, যদি না মানো, তাহলে মানবে না। সন্তান মানবে না, ঘরের বিবি মানবে না, এমনকী পালিত কুকুরও মানবে না!

আমরা তখন তন্ময় হয়ে হুজুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম! আহা, কত মূল্যবান উপদেশ! জীবন-অভিজ্ঞতার সাদামাটা বর্ণনা! দু শব্দে যেন সফলতার অব্যর্থ মন্ত্র! মির্জা মুহাম্মদ দাগ দেহলভির (১২৪৬-১৩২৩ হিজরি) এ চরণ, যা হজরত মাদানি রহ. সর্বদা আওড়াতেন, তাও হুজুর আমাদের শুনিয়েছেন,

مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے

مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔

অর্থ : বিপদাপদে মুচকি হাসা আমার আজন্ম স্বভাব
ব্যর্থতায় অশ্রু ঝরানো আমার আসে না।

আরেকটি চরণ, যা মাদানি রহ. আওড়াতেন এমন নয়, কিন্তু এটিও আড়াইহাজার-হুজুরের মুখে মুখে থাকত, এর রচয়িতা হলেন, জাকির হুসাইন সাকিব লাখনৌভি (১২৮৫-১৩৬৯ হিজরি),

باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو مرے

جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔

অর্থ : বাগান-পরিচারীর আগুনে যখন আমার ঘর পুড়ে

যার প্রতি ভরসা ছিল, সে পাতাই হাওয়া দিতে লাগে!

নিজের শায়খের মতো হজরত মাদানি রহ.-এর নামও কোনোদিন মুখে নেন নি হুজুর। কী পরিমাণ আদব! মাঝে মাঝে ইমাম গাজালি রহ. (৪৫০-৫০৫ হিজরি)-এর মুজাহাদার হেকায়েতও বলতেন।

ওসতাদের দেওয়া জুতা তিনি টুপি বানিয়ে মাথায় দিয়েছেন, তাঁর দিকে নিসবত করা (সম্বন্ধ করা) সে প্রসিদ্ধ ঘটনাটিও বারবার শুনিয়েছেন।

একবার সম্ভবত কুরবানি ইদের বিরতিলগ্নে ছাত্ররা বাড়ি যাওয়ার জন্য উশখুশ করছে। হুজুর বললেন, 'আপনারা তো বাড়ি যাবেন, ইদ করবেন, কত আনন্দ, তাই না?' আমরা জোরে বললাম, 'জি'। হুজুর বলেন, 'আমি যখন ভারতে ছিলাম। একদিন আপনাদের মতো আমার সাথি-ভাইয়েরাও, হজরত মাওলানা রইস উদ্দিন সাহেব রহ.-এর দরসে ছুটির জন্য ফিসফিস করছিলেন। হুজুর বুঝতে পারলেন, ছাত্ররা ছুটি চাচ্ছে। মনে মনে হুজুর ঠিকও করলেন, ছুটি দিয়ে দেবেন। আমি হুজুরের সামনে বসতাম। ইবারত পড়তাম। মনে মনে ভাবছি, যেহেতু ছুটি দিয়েই দেবেন, তাই আর কী ইবারত পড়ব! কিতাব বন্ধ করে ফেললাম! আর এ দৃশ্য হুজুরের চোখে পড়ে গেল। যথারীতি হুজুরের পছন্দ হলো না, এবং মারাত্মক রাগ করলেন! রাগ কাকে বলে! হুজুরের কথা হলো, ছুটি দেব আমি, কিতাব বন্ধ করব আমি! আপনারা আমার আগে কেন বন্ধ করলেন? তখন কোনো ছাত্রের সাধ্য ছিল না হুজুরের সামনে টুঁ শব্দ করার। ছাত্রদের সব ফিসফিস ও কানাকানি মুহূর্তে হাওয়া গেল। তারপর হুজুর সেই যে কিতাব খুললেন, একটানা জোহরের আজান। নুরুল আনওয়ারের মতো কিতাব গুনে গুনে ১২ পৃষ্ঠা পড়ালেন।

একসময় দরস শেষ হলো। আমি তো আপন জায়গায় দিব্যি বসে আছি। আসর যায়, মাগরিব আসে। পানি ঝরছে তো ঝরছেই। মনে হলো, এখন বুঝি রক্তও পড়বে। সাথি-ভাইয়েরা কতজন এল, কতভাবে বোঝাল। আমি আমার মতোই। চোখের জলে অবুঝ জীবন! এর মধ্যে হুজুর দূর থেকে কয়েকবার দেখে গেলেন, কিছু বললেন না। ইশার পর সামনে এসে হাত ধরে রুমে নিয়ে গেলেন। ওদিকে চোখে তখনো পানি। আদর করে চোখ মুছলেন। সান্ত্বনা দিয়ে মুখে লোকমা তুলে দিলেন!

এ ঘটনা শুনে আমরা ভাবতে লাগলাম, আজকে হয়তো ছুটি নেই। কিন্তু যথাসময়ে হুজুর ছুটি দিয়ে দিলেন। তবে সকলকে বাড়িতে গিয়ে বছরের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত যা পড়ানো হয়েছে সব, দোয়াত-কলমে লিখে আনতে বললেন। আমার এখনো মনে আছে, বিরতির পর হুজুর সকলের খাতা দেখেছিলেন, এবং যারা অলসতা করেছে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। দরসে হুজুর বলতেন, 'আমার কাছে যারা কোনো কারণে শাস্তি পেয়েছে, তাদের নাম ধরে আমি আল্লাহর কাছে কান্না করি। তাদেরকে আল্লাহর কাছে কবুল করিয়ে নিই। আপনারা তো অনেক পরে এসেছেন, আমার কথা বিশ্বাস নাও হতে পারে। সম্ভব হলে মাওলানা আবুল ফাতাহ, মাওলানা হাবিবুর রহমান ঝালকাঠী, মাওলানা ইহসানুল্লাহ, মাওলানা কেফায়েতুল্লাহকে জিজ্ঞেস করে নেবেন!'

কী আর জিজ্ঞাসা করব?! হুজুর বলেছেন, তাতেই আমাদের ষোলোআনা বিশ্বাস হয়ে যেত। তা ছাড়া বাস্তবিকই আমরা দেখেছি, কোনো ছাত্র পড়া পারছে না। হুজুর একবার, দুবার, তিনবার দেখতেন। তারপর তাকরারের জিম্মাদারকে জিজ্ঞেস করতেন, 'কী হয়েছে ওর? পড়া কেন পারছে না?' তাকরারের জিম্মাদারকে জিজ্ঞাসাবাদের পরও যখন দেখছেন, অলসতাবশত সে পড়া ইয়াদ (শিখছে) করছে না, তখন হুজুর বেত নিতেন। আর যদি দেখতেন, মেধার দুর্বলতা আছে, তাহলে শাসাতেন, বেত দিতেন না। হ্যাঁ, তার মেহনত অব্যাহত আছে কি না খোঁজ রাখতেন।

হুজুর যেদিন বেত হাতে নিতেন বলাবাহুল্য সেদিন খুবই ভয়ের দিন হতো। উৎকণ্ঠায় ধমনি কাঁপত। অবশ্য দরসের পর যাকে প্রহার করেছেন, তার খবর নিতেন। একান্তে ডেকে স্নেহ করতেন। বোঝাতেন। তারপর সে কি পড়াশোনা শুরু করেছে, নাকি অবস্থা এখানো আগের মতো, গোপনে তদারকি করতেন। তাহাজ্জুদের সময় সে ছেলের নাম ধরে কান্নাকাটি করতেন। আমাদের কয়েকজন

সাথির আজন্ম আফসোস ছিল, জীবনে একটিবারের জন্যও কেন হুজুরের হাতে বেত খেতে পারল না। কমসে কম এই বাহানাতেও যদি কবুল হওয়া যায়! অধমও তাদের একজন!

উর্দু ভাষায় হুজুরের বিশেষ দক্ষতা ছিল। হুজুরের উর্দু-উচ্চারণ শুনলে মনে হতো, কোনো উর্দুভাষী কথা বলছেন। প্রতিটি শব্দ তার উৎসমূল থেকে এত পরিষ্কার উচ্চারণ করতেন, আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবতাম যেন হুজুরের মাতৃভাষা উর্দুই!

সম্ভবত ২০০৯ সালে একবার দেওবন্দ থেকে হজরত মাওলানা আবদুল হক আজমি সাহেব এসেছেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। জুমআর পর আজমি সাহেব থেকে হাদিসের সবক নেওয়ার জন্য দাওরার বড় ভাইয়েরা মুহতামিম সাহেবের কাছে আবেদন করলেন। মুহতামিম সাহেব বললেন, 'আগে হজরত থেকে অনুমতি নিতে হবে। হজরত রাজি থাকলে তারপর।' এদিকে মসজিদে ছাত্ররা কিতাব আর তেপায়া নিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেদিন হজরত খুব ক্লান্ত ছিলেন। মাত্র সফর করে এসেছেন। আহার-পর্ব শেষ না হতেই আবার দরস, বিষয়টি একটু মুশকিলই। ওদিকে ছাত্ররা অনেকক্ষণ মসজিদে বসে থাকার দরুন খুচরা ফিসফিস করতে করতে একসময় শোরগোল শুরু করে দিল। যথাক্রমে আওয়াজ অনেক বেড়ে গেল। আর তখনই আড়াইহাজার-হুজুর মসজিদের পাশের রুম থেকে বের হয়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে এমনভাবে কথা বলা শুরু করলেন, ছাত্ররা আওয়াজ করবে তো দূরের কথা, শ্বাস ফেলতে যেন শঙ্কা করছিল। সেদিন পুরো সময় হুজুর উর্দুতে কথা বলেছিলেন। শুরুতেই হুজুর মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি রহ.-এর (৬০৪-৬৭২ হিজরি) এ চরণ আবৃত্তি করলেন,

از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم گشت از لطف رب۔

অর্থ : আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন পাই তাওফিক আদবের,

বেয়াদব সে তো বঞ্চিত হয়, দয়া পায় না সে রবের।

তারপর অনেক কথা বললেন। প্রথম মসজিদের আদব সম্পর্কে কথা বললেন। তারপর আকাবিরে ওলামায়ে দেওবন্দের কীর্তি নিয়ে কথা বললেন। তাঁদেরকে আজমত ও মুহাব্বত করা নিয়ে কথা বললেন। একপর্যায়ে এও বললেন, 'আমাদেরকে সন্দ্বীপের হজরত রহ. আকাবিরে দেওবন্দের আজমত ও মুহাব্বতের ব্যাপারে এত কথা বলেছেন, যার ফলে তাঁদের ব্যাপারে আমাদের আজমত এ পর্যায়ে চলে গেছে যে, স্বচক্ষে তাঁদেরকে দেখার পরও আজমত আরেকটু বৃদ্ধি পাবে, এমনটা হবে না। ওই যে সাহাবায়ে কেরামের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনতে শুনতে ইয়াকিন ও বিশ্বাস এ স্তরে পৌঁছে গেছে যে, জান্নাত-জাহান্নাম চোখে দেখার পর তাদের ইয়াকিন ও বিশ্বাস আর বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আপনারা আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে কীভাবে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছেন? তা ছাড়া আমাদের মুরব্বি এসেছেন। ওসতাদ এসেছেন। অন্তত তাঁর খাতিরে তো আপনাদের সাবধান হওয়ার দরকার ছিল।' সেদিন হুজুরের কথাগুলো মনে দাগ কাটার মতো ছিল। অত্যন্ত দরদ ও আবেগ নিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন।

বলছিলাম হুজুরের উর্দু উচ্চারণের কথা। আমাদের কানে যেন এখানো হুজুরের সেই বক্তব্যের আওয়াজ প্রতিধ্বনি করে। হুজুর উর্দু ভালো জানতেন। তাই বলে বাংলা জানতেন না, এমনটা ভাবা ভুল। হুজুরের বাংলাও সুন্দর ছিল। মাদরাসায় আসার আগে হুজুর মেট্রিক পর্যন্ত পড়েছেন। মুফতি শফি রহ. (১৩১৪-১৩৯৬ হিজরি) ও সাইয়িদ আরশাদ মাদানি সাহেবের দুটি পুস্তিকার অনুবাদও করেছেন। প্রথম জেল-জীবনের স্মৃতিগদ্য লিখেছেন। নিজের ছোট বোনকে ১৮ পৃষ্ঠার বড় একটি চিঠি লিখেছেন। তাতে সংক্ষিপ্তভাবে জীবন চলার উপযোগী প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল

লিপিবদ্ধ করেছেন। আরও কিছু কাজ পাণ্ডুলিপি আকারে রেখে গেছেন। মাওলানা হানিফ আল হাদী ভাইয়ের সম্পাদনায় উক্ত অনুবাদ দুটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিতও হয়েছে।

তা ছাড়া হুজুর মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের যথারীতি বাংলাচর্চায় উৎসাহিত করতেন। আমাদের সাথি সালাহউদ্দীন আহসান ভাই আমাকে তার নিজের ঘটনা শুনিয়ে বলেছিলেন, একবার সে মসজিদের নিচতলায় বসে প্রবন্ধ কী রোজনামচা লিখছিল, আচমকা আড়াইহাজার-হুজুর উপস্থিত হয়ে বললেন, 'কী লিখছিস?' সে খাতা হুজুরের হাতে তুলে দিলে হুজুর তা পাঠ করে যথেষ্ট খুশি হন ও আন্তরিক উৎসাহ প্রদান করেন, এবং নিয়মিত চর্চা অব্যাহত রেখে আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেন। এ থেকে হুজুরের দূরদর্শিতা ও সমাজ-সচেতনা বুঝে আসে। সময়ের প্রয়োজনে নিজ সন্তানদের যে আরও একাধিক বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে হয়, তাও স্পষ্ট হয়ে আসে। কারণ, তারা ভিন্ন ও নতুন এক প্রেক্ষাপটে জন্মলাভ করেছে, যা তাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে ভিন্ন।

৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪ ইসায়িতে *আজকের ইসলাহী জোড়ে* প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে হুজুর জানান দেন, সন্দ্বীপের হজরত রহ.ও বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের জন্য দীনচর্চা বেগমান করার লক্ষ্যে বাংলা লেখালেখি পছন্দ করতেন। হুজুর বলেন,

> 'হজরত রহ. লেখালেখির প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। কেননা, কথায় আছে, اَلْكِتَابَةُ نِصْفُ الْعِلْمِ। অর্থাৎ লেখা হলো, জ্ঞানের অর্ধেক। তোমরা ছাত্ররা উদ্যোগ নিয়ে যে কাজটি শুরু করেছ (অর্থাৎ ইসলাহী জোড়ের বয়ানগুলো লিখিতরূপে বিতরণ করা), হজরত রহ. এটা দেখলে খুবই খুশি হতেন! হজরতের সে খুশির পরিমাণ ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব না! এ মেহনত কয়জন করতে পারে? তোমরা মাশাআল্লাহ সম্পূর্ণ কাজই আসাতিজায়ে কেরামের পরামর্শে ও নিয়ন্ত্রণে করছ, এটা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়।'[১০]

অনেক আগে আমাদের ওসতাদ ও সন্দ্বীপের হজরত রহ.-এর শাগরিদ, শিবপুরের মাওলানা আবদুল বাতেন সাহেব বলেছিলেন, 'আড়াইহাজার-হুজুর প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার পাশাপাশি উর্দু ভাষা শেখতেও বিশেষ মেহনত করেছিলেন।'

আমাদের জন্য হুজুরের দরসের সবটাই নিয়ামত ছিল। বিশেষকরে মাত্র এক বছর পড়ার মাধ্যমে উর্দু ভাষা আমাদের যেভাবে আয়ত্তে এসেছে, মনে হতো এভাবে আর কিছুদিন চললে আমরা উর্দুতে সাহিত্য রচনা করতে পারতাম! উর্দু ভাষার মৌলিক কাঠামো আমাদের হৃদয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ হুজুরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! অনেক ইচ্ছে ছিল সময়করে হুজুরের কাছ থেকে উর্দু ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সৌন্দর্য, নান্দনিকতা, বিশিষ্টতা, ব্যাপকতা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত জানব। কিন্তু .. জীবনে সবকিছু বোধহয় পূর্ণতা পায় না। ক্ষণকালের আভাসে অপূর্ণতাও যেন সত্যের মতো সুন্দর কোনো মায়া!

হুজুরের অনেক গুণ ছিল, যা লিখে শেষ করা যাবে না। তবে সব ছাপিয়ে একটি গুণের কথা বিশেষভাবে বলা যায়, তাহলো হুজুর ছাত্র গড়ার কারিগর ছিলেন। কোন ছাত্রকে কীভাবে গড়তে হবে, সেটা হুজুর খুব ভালো বুঝতেন। এটা আমাদের দেওবন্দিধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামকে শুধু মতবাদের মতো দার্শনিক কোনো বস্তু না বানিয়ে, বরং যা শিখেছ, তা-ই অপরকে শেখাও, এ রকম কার্যকারী নীতিতে, শিক্ষাকে নিজের ভেতরে ধারণ করে নেয়। শুধু তত্ত্ব কপচানোর মাঝেই আমাদের দীন না। আমাদের দীন আদর্শ ও তাত্ত্বিকতা, এবং সে অনুযায়ী নিজের ভেতর ধারণ করে

---

১০. হজরত মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর বিশেষ সাক্ষাৎকার, প্রকাশ : *আজকের ইসলাহী জোড়*, বর্ষ : ৪, সংখ্যা : ২, ৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরি, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪ ইসায়ি, ১৩ পৌষ ১৪২১ বাংলা, রোজ শনিবার, পৃষ্ঠা : ৩।

আমল করার নাম। হুজুর সবসময় 'মানে'র দিকে নজর দিতেন, 'পরিমাণে'র দিকে নজর কম থাকত। বেশি সবক দিতেন না, বাকি অল্প যেটা দিতেন, খুব ভালো করে আদায় করতেন।

একবার আমার মনে আছে, তখন নাহবেমির পড়ি। হুজুরের রুমে গেলাম। হুজুর বললেন, 'তোদের দরসে কী কী কিতাব পড়ানো হয়? আমি বললাম, *মালাবুদ্দা মিনহু*, *শরহু মিয়াতি আমিল*, অষ্টম শ্রেণির *বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, নাহবেমির, জুমাল, মিয়াতে আমিল, জাদুদ তালিবিন, এসো আরবি শিখি-৩, রওজাতুল আদব, আত-তামরিনুল কিতাবি, ইলমুস সরফ, পাঞ্জেগাঞ্জ, জুবদা, আসান কাওয়ায়েদে উর্দু*।

হুজুর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সরফের জন্য কী কী কিতাব পড়ানো হয়?' আমি বললাম, '*পাঞ্জেগাঞ্জ, জুবদা, ইলমুস সরফ*।' আমার কথা শুনে হুজুরের কপালে ভাঁজ পড়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'ওখানে (ভারতে) এক ফনের জন্য এতগুলো কিতাব পড়ানো হয় না। একটাই পড়ান হয়, ভালোকরে পড়ানো হয়।'[১১]

১১. এখানে প্রচ্ছন্নরূপে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো, যেহেতু বাংলাদেশের কওমি মাদরাসার শিক্ষাধারা অনেকটা ভারতের দেওবন্দি শিক্ষাক্রমে সজ্জিত। তা হলে সেখানে এক ফনের (শাস্ত্র) জন্য একটি কিতাব পড়ানো হলে, এখানে এক ফনের জন্য একাধিক কিতাব পড়ানো হয় কেন?

এর সরল উত্তর হলো, মূলত আমাদের এখানেও ফনের প্রতিটি স্তরে বুনিয়াদি কিতাব একটিই পড়ানো হয়। তবে যেহেতু পাঠ্য কিতাবগুলো বর্তমান সময়ের অনেক আগে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক রচিত, এবং নির্ধারিত কোনো পাঠ্যক্রমের আলোকে একাধিক ব্যক্তি দ্বারা সমন্বিত ক্যারিকুলামে তৈরিকৃত নয়। অথবা নির্ধারিত পাঠ্যক্রমে তৈরি হলেও বিশেষ সময়ের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তাতে প্রাসঙ্গিক হওয়ায়, সেইসব কিতাবে শাস্ত্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান নিতে পারে নি; অথচ যা জানা সে ফনের শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যক। তাই নির্ধারিত মৌলিক কিতাব পড়ানো শেষে সুযোগ মতো সম্পূরক হিসেবে একই ফনের অন্য কিতাবও পড়ানো হয়। আবার এক ফনের একাধিক 'মতনে'র (মূলপাঠ) সাথেও ছাত্রদের মুনাসাবাতের (সম্পর্কের) বিষয় থাকে, তাই একাধিক কিতাব পাঠ্যে রাখা হয়েছে। যেন একই আলোচনা একেকজন শাস্ত্রীয় ব্যক্তি নিজস্ব আন্দাজে (আঙ্গিকে) কীভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা জানা যায় এবং তাদের মধ্যকার ইত্তিফাক (ঐকমত্য) ও ইখতিলাফ (ভিন্নমত) চিহ্নিত করা যায়। আরও কিছু কথা আছে। প্রসঙ্গ দীর্ঘ হয়ে যাবে তাই অন্য কোথাও আলোচনার জন্য বরাদ্দ থাকল ইনশাআল্লাহ।